কণা ও প্রতিকণার লড়াই

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

আমরা সবাই মৌলিকভাবে পরমাণু দিয়ে তৈরি৷ না, ভুল বললাম৷ আরও মৌলিকভাবে তৈরি ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন কণা দিয়ে৷ আবারও ভুল৷ ইলেকট্রন মৌলিক হলেও প্রোটন ও নিউট্রনও মৌলিক নয়। তৈরি কোয়ার্ক কণা দিয়ে৷ নিউট্রনের কোনো বৈদ্যুতিক চার্জ নেই৷ তবে প্রোটনের চার্জ ধনাত্মক আর ইলেকট্রনের ঋণাত্মক৷ মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ কিংবা মহাবিশ্বের সব জড় পদার্থ এই কথাগুলো দিয়েই তৈরি৷   
  
তাত্ত্বিকভাবে প্রতিকণা দিয়েও তা হতে পারত৷ ইলেকট্রনের মতোই আছে আরেক কণা৷ যার সব কিছু ইলেকট্রনের মতোই৷ শুধু চার্জ ব্যতিক্রম। ধনাত্মক চার্জধারী এ কণার নাম পজিট্রন। একইভাবে প্রতিকণা আছে প্রোটনের৷ নাম অ্যান্টিপ্রোটন৷ নিউট্রনের চার্জ নেই। তবুও আছে প্রতিকণা৷ কারণ নিউট্রন মৌলিক কণা নয়। প্রোটনের মতো কোয়ার্ক দিয়ে তৈরি৷ নিউট্রন তৈরি এক আপকোয়ার্ক (চার্জ +২/৩) ও দুই ডাউন কোয়ার্ক (চার্জ -১/৩) দিয়ে। মোট চার্জ শূন্য। অন্যদিকে প্রতিনিউট্রনে থাকে একটি অ্যান্টি আপকোয়ার্ক (চার্জ -২/৩) ও দুটি অ্যান্টি ডাউন কোয়ার্ক (চার্জ +১/৩) দিয়ে। নিউট্রনের মতোই মোট চার্জ শূন্য৷   
  
এভাবে পজিট্রন, অ্যান্টিপ্রোটন ও নিউট্রন নিয়ে তৈরি হয় অ্যান্টিঅ্যাটম বা প্রতিপরমাণু৷ আর প্রতিপরমাণু দিয়েই তৈরি হয় অ্যান্টিম্যাটার বা প্রতিপদার্থ৷ এই যে আমি আপনি! কণাপদার্থবিদ্যার ভাষায় পদার্থ। হতে পারতাম প্রতিবস্তু বা প্রতিপদার্থ৷ দেহটা কণার বদলে প্রতিকণা দিয়ে তৈরি হলেই তা হত প্রতি-আমি বা প্রতি-আপনি৷ এভাবে হত প্রতি-পৃথিবী বা প্রতি-মহাবিশ্ব। একের সাথে অপরের দেখা হলেই কেবল দুটোই ধ্বংস। পদার্থ উধাও হয়ে তৈরি হবে শক্তি৷ তবে দেখা না হলে আলাদা আলাদা জগতে টিকে থাকতে পারবে কণার ও প্রতিকণার মহাবিশ্ব৷

কণার পাশাপাশি প্রতিকণারাও বাস্তবেও আছে। আমাদের চারপাশেই আছে৷ এই যেমন কলা থেকেই নির্গত হয় প্রতিবস্তু৷ কলায় আছে বিশেষ ধরনের এক পটাশিয়াম৷ পরমাণুটির এ আইসোটোপের নাম পটাশিয়াম-৪০৷ তেজস্ক্রিয় ভাঙন প্রক্রিয়ায় প্রতি ৭৫ মিনিটে এটি থেকে একটি পজিট্রন বের হয়৷ পটাশিয়াম-৪০-এর অর্ধায়ু ১২৫ কোটি বছর। মানে তেজস্ক্রিয় উপায়ে ভেঙে এ সময় পরে এটি এর অর্ধেক পরিমাণে নেমে আসে৷ এ আইসোটোপ আছে আমাদের দেহেও৷ তার মানে, আমার-আপনার দেহ থেকেও বের হচ্ছে পজিট্রন৷ অবশ্যই এরা অতিমাত্রায় ক্ষণস্থায়ী৷   
  
মহাকাশ থেকেও পৃথিবীতে আসে প্রতিকণা৷ অল্প পরিমাণ প্রতিবস্তু মহাজাগতিক রশ্মি আকারে প্রতিনিয়ত চলে আসে পৃথিবীতে৷ প্রতি বর্গ মিটারে একটি থেকে এক শটি পর্যন্ত প্রতিকণা এভাবে চলে আসে৷ পজিট্রন তৈরি হয় বজ্রমেঘের ওপরেও৷ ২০১৬ সালের এক পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ব্ল্যাকহোল ও নিউট্রন তারাও প্রচুর পরিমাণ ইলেকট্রন-পজিট্রন প্লাজমা তৈরি করে৷   
  
কণা ও প্রতিকণা সবসময় জোড়ায় জোড়ায় তৈরি হয়৷ বিগ ব্যাংয়ের সামান্য পরে এ কাজটাই ঘটেছিল৷ সেই বিশাল বিস্ফোরণের এক সেকেন্ডের বহু ভাগের এক ভাগেরও কম সময় পরেই শুরু কাজটা৷ এই সময়টায় ঘন ও উত্তপ্ত মহাবিশ্ব ছিল কণা ও প্রতিকণায় ভরপুর৷ সৃষ্টি হচ্ছিল আর বিপরীত কণার সাথে সংঘর্ষে ধ্বংস হচ্ছিল৷ কণা ও প্রতিকণা একইসাথে সৃষ্টি ও ধ্বংস হলে মহাবিশ্বে শক্তি ছাড়া কিছুই থাকার কথা নয়৷ থাকার কথা নয় কোনো বস্তুর উপস্থিতি।   
  
তবে খুব অল্প কিছু কণা বেঁচে যায়৷ প্রতি এক শ কোটিতে একটি৷ আজকে আমরা এই কণাদের গড়া পদার্থই দেখি৷ গত কয়েক দশকে কণাপদার্থবিদরা দেখিয়েছেন, পদার্থবিদ্যার সূত্র কণা ও প্রতিকণার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ হয় না৷ কণা ও প্রতিকণার রূপান্তর স্বতঃস্ফূর্ত৷ ধ্বংসের আগে কাজটা হয় বহু লক্ষ বার৷ কাজটায় হস্তক্ষেপ করে কোনো এক অজানা নিয়ামক৷ যার ফলে প্রতিকণাদের হারিয়ে মহাবিশ্বের দখল নেয় কণার দল৷   
  
ধরুন টেবিলে একটা কয়েন ঘুরছে৷ পড়ে গিয়ে হেড বা টেল পড়বে৷ তবে পড়ার আগ পর্যন্ত একে হেড বা টেল কোনোটাই বলা যাবে না৷ নির্ভেজাল মুদ্রার হেড ও টেল পড়ার সম্ভাবনা সমান পঞ্চাশ ভাগ করে৷ অনেকবেশি মুদ্রা টস করা হলে এর ফলাফল দেখা যাবে। এই যেমন এক হাজারবার টস করলে প্রায় ৫০০ করে হেড ও টেল পড়বে৷ এই একইভাবে প্রাথমিক মহাবিশ্বের অর্ধেক কণা থেকে বস্তু ও বাকি অর্ধেক থেকে প্রতিবস্তু তৈরি হওয়ার কথা। তবে বিশেষ কোনো কারণ ঘটলে মুদ্রায় হেড ও টেলের সংখ্যায় ব্যতিক্রম হতে পারে৷ হয়৷ এই যেমন মুদ্রার টেবিলে কোনো বিশেষ মার্বেল ছেড়ে দেওয়া হলো যা মুদ্রাকে শুধু একদিকে পড়তে বাধ্য করবে৷ এমন অজানা কোনো প্রক্রিয়া হয়তোবা প্রতিকণার চেয়ে বেশি কণা তৈরি হতে কাজ করেছিল৷ কী সেই অজানা প্রক্রিয়া? জানা নেই কারও।   
  
পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কণাত্বরকযন্ত্র হয়তো সে প্রক্রিয়ার কথা জানাতে পারবে৷ সার্নের সে যন্ত্রের নাম লার্জ হ্যাড্রোন কোলাইডার (এলএইচসি)৷ যে যন্ত্রে উচ্চশক্তিতে তৈরি করা হয় কণা ও প্রতিকণা৷ তবে গবেষণার প্রয়োজন ছাড়াও বাস্তব কাজেও ব্যবহার আছে প্রতিকণার।

প্রতিকণার ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম তত্ত্বের মিলনের গল্প। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের হাতে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় কোয়ান্টাম তত্ত্বের। ১৯২০ এর দশকের কথা। পদার্থবিদরা চেষ্টা চালাচ্ছেন প্ল্যাঙ্কের শক্তির কোয়ান্টার ধারণা পরমাণু ও এর উপদানে প্রয়োগ করতে৷ ঐ দশকের শেষের দিকে শ্রোডিঙ্গার হাইজেনবার্গ কোয়ান্টাম তত্ত্বকে দাঁড় করিয়ে ফেললেন৷ কিন্তু সমস্যা থেকে গেল। কোয়ান্টাম তত্ত্ব শুধু খাটে ধীরে চলা কণার জন্য। উচ্চ বা আপেক্ষিকতাবাদী বেগে তত্ত্ব কাজ করে না।   
  
সমাধান এল পল ডিরাকের হাত ধরে৷ তাঁর ডিরাক সমীকরণ উচ্চ বেগে চলা ইলেকট্রনের জন্যও কাজ করল। পুরো পরমাণু এখন মেনে চলে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব৷ এ কাজের জন্য তিনি ১৯৩৩ সালে নোবেল পুরস্কার পান। তবে এ সমীকরণ সমস্যাও একটা তৈরি করলই। যেমনটা বলেছিলেন, জর্জ বার্নাড শ। বিজ্ঞান একটা সমস্যা তৈরি করতে আরও দশটা নতুন সমস্যা তৈরি করে। x2 = 4 সমীকরণের দুটি সমাধান আছে। ২ ও (-২)। দুটোর জন্যই সমীকরণ সমান সত্য। ডিরাকের সমীকরণেও এমন দুটি সমাধান আছে৷ একটায় ইলেকট্রনের শক্তি ঋণাত্মক, আরেকটায় ধনাত্মক৷   
  
তবে চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান বলে, কণার শক্তি সবসময় ধনাত্মক হবে৷ ডিরাক তাই এ ব্যতিক্রমী কণার ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হলেন৷ বললেন, প্রতিটি কণারই একটি বিপরীত কণা বা প্রতিকণা আছে৷ যার সবকিছু একই, শুধু চার্জ বিপরীত৷ ইলেকট্রনের আছে প্রতিইলেকট্রন৷ ডিরাক প্রতিকণা ও প্রতিবস্তু দিয়ে গড়া সম্পূর্ণ এক মহাবিশ্বের কথাও অনুমান করেন৷ আসলে অন্য কোনো গ্রহ না নক্ষত্রও প্রতিবস্তু দিয়ে গড়া হতেই পারে৷ তাতে পরমাণু তৈরি হবে পজিট্রন ও অ্যান্টিপ্রোটন দিয়ে৷   
  
১৯৩২ সালে কার্ল অ্যান্ডারসন মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে কাজ করতে গিয়ে পজিট্রনের দেখা পান। পজিটিভ বা ধনাত্মক চার্জের কারণে পজিট্রন নামটা তিনিই দেন। তার বিশ বছর আগে ভিক্টর হেস মহাজাগতিক রশ্মি আবিষ্কার করেন। এ আবিষ্কারের জন্য দুই বিজ্ঞানী ১৯৩৬ সালের নোবেল পুরস্কার পান৷ প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে এরপর নতুন নতুন প্রতিকণারা আবিষ্কৃত হতে থাকে। ১৯৫৫ সালে বেভাট্রন যন্ত্রে ধরা পড়ে অ্যান্টিপ্রোটন। একে তক্ষণ ডাকা হত নেগেটিভ প্রোটন বলে। একই যন্ত্র পরের বছর আবিষ্কার করে অ্যান্টিনিউট্রন কণা। এর মাধ্যমে পরমাণু তৈরির জন্য প্রয়োজন তিন কণারই (ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন) প্রতিকণা পাওয়া গেল।

পরমাণুর কেন্দ্রকে বলা হয় নিউক্লিয়াস, যেখানে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন। ১৯৬৫ সালে জানা গেল, কণার মতো প্রতিকণারাও নিউক্লিয়াস বানায়। এ সময় পাওয়া গিয়েছিল অ্যান্টিডিউটেরন নিউক্লিয়াস। অ্যান্টিডিউটেরন দুই ভরের হাইড্রোজেন ডিউটেরনের প্রতিপরমাণু। সাধারণ হাইড্রোজেনে শুধু একটি প্রোটন থাকে। নিউক্লিয়াসে প্রোটনের সাথে নিউট্রন থাকলে সে হাইড্রোজেনকে বলে ডিউটেরন। ১৯৭০-এর দশকে রাশিয়ার একদল বিজ্ঞানী প্রোটন-নিউক্লিয়াস সংঘর্ষে অ্যান্টিহিলিয়ামের দেখা পান। ১৯৯৫ সালে সার্নের গবেষণাগারে তৈরি হয় প্রতিপরমাণু প্রতিহাইড্রোজেন।

কিন্তু প্রতিবস্তু তৈরি ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য কাজ৷ সামান্য পরিমাণ প্রতিবস্তু বানাতেই খরচ হয় বিলিয়ন ডলার৷ তার ওপর একে সংরক্ষণের কাজও জটিল৷ সাধারণ পদার্থ দিয়ে তৈরি কোনো পাত্রে তো আর একে রাখা যাবে না। দেখা হলেই যেখানে ধ্বংস সেখানে একত্রে বসবাস অসম্ভব। বুদ্ধি একটা অবশ্য আছে। বিজ্ঞানীরা এজন্য কাজে লাগান পেনিং ট্র্যাপ নামে এক যন্ত্র। প্রতিপদার্থকে চার্জিত কণা হিসেবে তড়িৎ ও চুম্বকক্ষেত্রের সমন্বয়ে তৈরি ক্ষেত্রের মধ্যে ধরে রাখা হয়। গবেষণার কাজে সার্ন ও ফার্মিল্যাবে তৈরি হয় প্রতিবস্তু৷ এখানে এ পর্যন্ত মাত্র ১৫ ন্যানোগ্রাম প্রতিবস্তু তৈরি হয়েছে৷ তবে যুক্তরাষ্ট্রের লরেন্স লিভারমোর ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি এ কাজে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। হিসাব করে দেখা যায়, সবমিলিয়ে তারা তৈরি করেছেন এক হাজার কোটি পজিট্রন৷

প্রতিবস্তুর প্রায়োগিক ব্যবহার আছে প্রচুর। মেডিকেল ইমেজিংয়ে কাজে লাগে পজিট্রন নির্গমন। ক্যান্সারের চিকিৎসায় ব্যবহার করা যায় অ্যান্টিপ্রোটন। রকেটে প্রতিবস্তু ব্যবহারের প্রস্তাব ঘুরছে বিজ্ঞানীদের মাথায়। বুদ্ধিটা সরল ও চমৎকার। বস্তু ও প্রতিবস্তুর মিশ্রণ থেকে পাওয়া যাবে বিপুল শক্তি। প্রস্তাবিত যেকোনো রকেটের চেয়ে যার শক্তির ঘনত্ব হবে বেশি।   
ফিরে আসি কনা-প্রতিকণার লড়াইয়ে। দেখা হলেই একে অপরকে ধ্বংস করে কেন এরা? কোয়ান্টাম তত্ত্বে কণারা নিছক কণাই নয়। তরঙ্গও বটে। প্রতিকণার আসলে শুধু চার্জই আলাদা নয়, তরঙ্গের চিহ্নও বিপরীত। এভাবে ভাবলেই বোঝা সহজ হয়ে যায়। সাইরেন বাজিয়ে গাড়ি কাছে আসলে উচ্চশব্দ শোনা যায়। দূরে গেলে আবার শব্দ কমে। আসলে আগের ও পরের তরঙ্গের মিলন তরঙ্গের বিস্তারকে বড় বা ছোট করে দেয়। আলোর ক্ষেত্রেও এটা হয়। দুটি আলো নিক্ষেপ করলে কিছু জায়গায় উজ্জ্বল আর কিছু জায়গা অনুজ্জ্বল হয়। আবার বিপরীত দিক থেকে আসা আলো দিয়ে নির্দিষ্ট কোনো বিন্দুকে অন্ধকার করেও দেওয়া সম্ভব। একই কাজ করা যায় শব্দতরঙ্গ দিয়ে। বাস্তবেও আছে। এর নাম নয়েজ ক্যান্সেলেশন প্রযুক্তি। এটা আসলে একটা হেডফোন। যার মধ্যে থাকে একটি নিজস্ব মাইক্রোফোন। আশেপাশের নয়েজের সমান ও বিপরীত তরঙ্গ তৈরি করে শব্দকে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়।

কোয়ান্টাম তত্ত্বে কণা-তরঙ্গরা ফিল্ড বা ক্ষেত্রে স্পন্দিত হয়। সামুদ্রিক তরঙ্গে যেমন সমুদ্র ফিল্ড হিসেবে কাজ করে। একইভাবে ইলেকট্রন, কোয়ার্করাও ইলেকট্রন বা কোয়ার্ক ফিল্ডে স্পন্দিত হয়। ইলেকট্রন ফিল্ড একদিকে স্পন্দিত হলে তাকে আমরা ইলেকট্রন বলি। অন্যদিকে স্পন্দিত হলে বলি পজিট্রন। কারণ ইলেকট্রন চার্জ পায় তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে। বিপরীত দিকে স্পন্দন তৈরি করে বিপরীত চার্জ। আর তাই দেখা হলেই এক তরঙ্গ আরেকটিকে বিনাশ করে দেয়। তাদের শক্তিটুকু ফিরে যায় তড়িচ্চুম্বকীয় ক্ষেত্রে। তৈরি হয় গামা রশ্মি।

কণা ও প্রতিকণার মিলনে কী তৈরি হবে তা নির্ভর করে কণার প্রকৃতির ওপর৷ ইলেকট্রন ও পজিট্রনের দেখায় তৈরি হয় তড়িচ্চুম্বকীয় শক্তি। আরও ভাল করে বললে গামা রশ্মি৷ গামা বিকিরণ আমরা খালি চোখে দেখি না৷ তবে যন্ত্রে ধরা পড়ে এর অস্তিত্ব৷ অবশ্য কণার ওপর নির্ভর করে শক্তির পাশাপাশি অন্য কণাও তৈরি হতে পারে৷ এই যেমন নিউট্রিনো ও বিভিন্ন ফ্ল্যাভারের কোয়ার্ক৷ এই নতুন কণার ভর আগের কণার চেয়ে কম হবে। কারণ সোজা। কিছু ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে৷ এই শক্তি থাকে মূলত তাপ ও আলো আকারে৷   
  
আমরা সাধারণত ইলেকট্রন-প্রোটনদের তড়িচ্চুম্বকীয় বলের কথা ভাবি৷ তবে এ কণারা অন্য বলও অনুভব করে৷ ইলেকট্রন অনুভব করে দুর্বল নিউক্লীয় বল৷ প্রোটনরা অনুভব করে দুর্বল ও সবল নিউক্লীয় বল৷ বস্তু ও প্রতিবস্তুর মিলনে এই দুই ধরনের বল থেকেই শক্তি নির্গত করে৷ বহুল আলোচিত হিগস বোসন আসলে এক ধরনের দুর্বল নিউক্লীয় বলের শক্তি৷ তবে দুর্বল ও সবল নিউক্লীয় বলের পাল্লা খুব স্বল্প। বেশী দূরত্বে থেকে এরা কাজ করতে পারে না। অন্যদিকে তড়িচ্চুম্বকীয় বলের পাল্লা অসীম। তবে কণাদেরকে উচ্চ বেগ ও শক্তি প্রদান করলে অতড়িচ্চুম্বকীয় শক্তি উৎপন্ন হতে পারে। যে কাজটা হয় সার্ন বা ফার্মিল্যাবে।

প্রতিকণা নিয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এর হারিয়ে যাওয়া নিয়ে। হয় বিগ ব্যাংয়ের সময় প্রতিকণা কোনো অজানা কারণে আসলেই কম প্রতিকণা তৈরি হয়েছিল। আর নাহয় দূর মহাবিশ্বের কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে। কারণটা যাই হোক, আপাতত সেটাই আমাদের জন্য ভাল। দেখা হলেই যে ধ্বংস!

লেখক: প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, সিলেট ক্যাডেট কলেজ

সূত্র: অ্যাস্ট্রোনমি ডট কম, ইউসিএল ডট এসি ডট ইউকে, সার্ন ডট কম, সিমেট্রি ম্যাগাজিন   
  
  
  
<https://www.astronomy.com/science/when-matter-and-antimatter-annihilate-each-other/>  
  
<https://www.ucl.ac.uk/culture-online/case-studies/2022/mar/what-happens-when-matter-and-antimatter-collide>

<https://www.quora.com/Why-do-matter-and-antimatter-annihilate-each-other-Is-the-difference-between-matter-and-antimatter-merely-one-of-electrical-charge>

<https://home.cern/science/physics/matter-antimatter-asymmetry-problem>  
  
<https://www.symmetrymagazine.org/article/april-2015/ten-things-you-might-not-know-about-antimatter>  
  
<https://timeline.web.cern.ch/timeline-header/86#0>